খাদ্য নিরাপত্তায় বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ: সরকারের কর্মসূচিতে নতুন আশার দিগন্ত

এ এম ইমদাদুল ইসলাম

বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাসে কৃষি কেবল একটি অর্থনৈতিক খাত নয় এটি জাতির আত্মনির্ভরতা, সংগ্রাম, স্থিতিস্থাপকতা এবং সাফল্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। স্বাধীনতার পর যে বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় বৈদেশিক সহায়তার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল, আজ সেই দেশ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, মজুদ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশ্বের সামনে একটি সফল ও অনুসরণীয় উদাহরণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দীর্ঘ অভিযাত্রার পেছনে রয়েছে কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম, কৃষি গবেষণার ধারাবাহিক অগ্রগতি, আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, সময়োপযোগী নীতি গ্রহণ এবং সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

এই অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় ২১ জুলাই ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তার ইতিহাসে একটি অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করে। এদিন সরকারি গুদামে খাদ্যশস্যের মোট মজুদ দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৩ লাখ ৯৭ হাজার ৫২৭ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। অন্যদিকে, নিরাপদ খাদ্য মজুদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ধরা হয় ১৩ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় নিরাপদ মজুদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

এই অর্জন কেবল একটি পরিসংখ্যানগত সাফল্য নয়; এটি আত্মনির্ভর বাংলাদেশের সক্ষমতা, পরিকল্পিত রাষ্ট্র পরিচালনা এবং কৃষি খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল প্রতিফলন। সুপরিকল্পিত কৃষিনীতি, আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ অবকাঠামো, দক্ষ মজুদ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিমুখী উদ্যোগ এবং কার্যকর সরকারি নীতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই খাদ্যভান্ডার দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য চাহিদা পূরণে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্ন কিংবা অন্য যেকোনো জাতীয় সংকট মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা বলয় হিসেবে কাজ করবে। একই সঙ্গে এটি দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তব সাফল্যেরও প্রমাণ বহন করে।

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য মজুদের এই সাফল্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সঠিক পরিকল্পনা, কৃষিবান্ধব নীতি, গবেষণানির্ভর প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষকের নিরলস পরিশ্রম একত্রে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। এই অর্জন শুধু বর্তমানের নয়; ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও একটি শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণ করেছে। আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ, সমৃদ্ধ কৃষি এবং টেকসই উন্নয়নের পথে এটি একটি গৌরবোজ্জ্বল ও ঐতিহাসিক মাইলফলক।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল খাদ্য ঘাটতি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের কৃষি অবকাঠামো ছিল দুর্বল, উৎপাদন ছিল সীমিত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল প্রায় নিত্যসঙ্গী। সে সময় দেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৭ কোটি, অথচ খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল মাত্র ১ কোটি টনের কিছু বেশি। ফলে দেশের মোট খাদ্য চাহিদার একটি বড়ো অংশ আমদানি এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে পূরণ করতে হতো। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তখন রাষ্ট্রের জন্য ছিল অন্যতম কঠিন অগ্রাধিকার।

কিন্তু গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের কৃষিখাতে এক নিরব অথচ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং অন্যান্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ও জলবায়ু-সহনশীল জাত, সেচ সুবিধার বিস্তার, উন্নতমানের বীজের ব্যবহার, সুষম সার ব্যবস্থাপনা, কৃষিযান্ত্রিকীকরণের প্রসার এবং কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও বিভিন্ন প্রণোদনা কৃষি উৎপাদনে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির বিস্তার এবং কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করার ফলে উৎপাদনশীলতা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশে ধান, গম ও ভুট্টাসহ মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন বছরে প্রায় ৫ কোটি টনের কাছাকাছি পৌঁছেছে। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ উৎপাদনকারী দেশের একটি, যা দেশের কৃষিখাতের সক্ষমতা, গবেষণার সাফল্য এবং কৃষকের অবদানের এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি, মাঠপর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম, আধুনিক কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার এবং জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তির বিস্তারের ফলে দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। একই সঙ্গে আধুনিক সাইলো নির্মাণ, খাদ্যগুদামের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল মজুদ ব্যবস্থাপনা, স্বয়ংক্রিয় তথ্যভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং উন্নত সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার বিকাশ দেশের সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ, গতিশীল ও কার্যকর করেছে। উৎপাদন থেকে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণ থেকে ভোক্তার কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রতিটি ধাপে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার প্রসার খাদ্যশস্যের অপচয় কমিয়েছে, ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে এবং সংকটকালেও দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা জোরদার করেছে।

পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ একটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা সক্ষমতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সরকারি গুদামে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ থাকলে প্রয়োজনের সময় দ্রুত বাজারে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায় এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট বা মূল্য অস্থিতিশীলতার ঝুঁকিও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, খরা কিংবা অন্য যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে দ্রুত খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, ভিজিএফ ও ভিজিডিসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সরকারি খাদ্য মজুদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি, বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থার বিঘ্ন কিংবা আমদানি ব্যাহত হওয়ার মতো পরিস্থিতিতেও পর্যাপ্ত মজুদ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে, জরুরি আমদানির চাপ কমাতে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে আস্থা সুদৃঢ় করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ফলে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুদ কেবল খাদ্যের নিশ্চয়তাই দেয় না; এটি একটি দেশের আত্মনির্ভরতা, সংকট মোকাবিলার সক্ষমতা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

খাদ্য নিয়ে আলোচনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security) এবং নিরাপদ খাদ্য (Food Safety)। শব্দ দুটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও তাদের অর্থ, উদ্দেশ্য এবং কার্যপরিধি এক নয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর মতে, প্রকৃত উন্নয়ন তখনই নিশ্চিত হয়, যখন মানুষ শুধু পর্যাপ্ত খাদ্যই নয়, নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যও নিয়মিতভাবে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ খাদ্যের পর্যাপ্ততা এবং খাদ্যের মান—উভয়ই মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্যকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে প্রত্যেক মানুষ সব সময় পর্যাপ্ত, পুষ্টিকর এবং সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য লাভের সুযোগ পায়। এর চারটি মৌলিক ভিত্তি হলো—খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্যে প্রবেশাধিকার, পুষ্টিসম্মত ব্যবহার এবং ধারাবাহিক সরবরাহ। অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়; বরং উৎপাদিত খাদ্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, বাজারে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ বা সংকটকালেও খাদ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, নিরাপদ খাদ্য বলতে এমন খাদ্যকে বোঝায়, যা উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ এবং ভোক্তার টেবিলে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচালিত হয় এবং যাতে ভেজাল, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, অতিরিক্ত কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, জীবাণু কিংবা অন্য কোনো ক্ষতিকর দূষক উপস্থিত না থাকে। কারণ খাদ্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত হলেও তা যদি নিরাপদ না হয়, তবে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে এবং পুষ্টি নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হতে পারে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে খাদ্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা ও প্রাপ্তির সুযোগ, আর নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করে সেই খাদ্যের গুণগত মান, স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা এবং ভোক্তার সুরক্ষা।

নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার "নিরাপদ খাদ্য (রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২৬" জারি করেছে। এই প্রবিধানমালার আওতায় খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ, পরিবহণ, সরবরাহ এবং বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স গ্রহণের বিধান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খাদ্য ব্যবসার প্রতিটি স্তরে জবাবদিহি, মান নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে। একই সঙ্গে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আরও সুস্পষ্ট হবে, যা ভোক্তার অধিকার সুরক্ষা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং একটি নিরাপদ ও টেকসই খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার স্বীকৃত পরীক্ষাগারে খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার পাশাপাশি মোবাইল ল্যাব ও মিনি ল্যাবের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে মাঠপর্যায়ে দ্রুত অনিয়ম শনাক্ত করা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। একই সঙ্গে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ, খাদ্য ব্যবসায়ীদের তথ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এ ছাড়া টোল-ফ্রি হটলাইন ১৬১৫৫-এর মাধ্যমে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে খাদ্যে ভেজাল, নিম্নমানের খাদ্য বা অন্য যেকোনো অনিয়ম সম্পর্কে অভিযোগ জানানোর সুযোগ রয়েছে। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, দ্রুত অভিযোগ গ্রহণ ও

অনুসন্ধান, কার্যকর তদারকি এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে একটি অংশগ্রহণমূলক ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি আইনগত কাঠামো শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সরকার নিরাপদ, পুষ্টিকর ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা কেবল বর্তমান সময়ের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন নয়; এটি আগামীর উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ, আধুনিক সংরক্ষণ অবকাঠামো, দক্ষ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি ও প্রযুক্তির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই অর্জনকে আরও টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী করতে কৃষক, গবেষক, উদ্যোক্তা, খাদ্য ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং সরকারের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা অপরিহার্য। কারণ নিরাপদ, পুষ্টিকর, মানসম্মত এবং সবার জন্য সহজপ্রাপ্য খাদ্য নিশ্চিত করা গেলে গড়ে উঠবে একটি সুস্থ, কর্মক্ষম, মেধাবী ও উৎপাদনশীল জাতি। আর দক্ষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এই মানবসম্পদই হবে টেকসই উন্নয়ন অর্জন এবং একটি সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকাশক্তি।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার